বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার
১৩তম বার্ষিক সম্মেলন
১৩ নভেম্বর, ২০১৬, রবিবার
সকাল ১০টা থেকে ৪টা
স্থান ঃ রিভার রিসার্চ ইনিস্টিটিউট
মোহনপুর, নদীয়া।
সকলের উপস্থিতি কাম্য।

গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির
২১ জানুয়ারী, ২০১৭, শনিবার
"রাতে তারা চেনা"
(বিকাল-৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা)
২২ জানুয়ারী, ২০১৭, রবিবার
"গাছপালা, পাখি চেনা"
(সকাল ৭টা থেকে বিকাল-৪টা)
স্থান ঃ রিভার রিসার্চ ইনিস্টিটিউট
মোহনপুর, নদীয়া।

বর্ষ-১৩ | সংখ্যা - ৫ | সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৬ | RNI No. WBBEN/2003/11192 | মূল্য : ২ টাকা

পিপীলিকা পুরাণ

রাজদীপ ভট্টাচার্য্য

এখন থেকে প্রায় ১১-১৩ কোটি বছর আগে ক্রিটেসিয়াস যুগে পৃথিবীতে পিপীলিকার উৎপত্তি হয়। সপুষ্পক উদ্ভিদের বিকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রজাতি ও উপপ্রজাতির পিপড়ে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ২২০০০ প্রজাতির পিঁপড়ে রয়েছে। অ্যান্টার্টিকা এবং একই প্রকারের অতিপ্রতিকূল

এরপর 4 পাতায়

প্রতিরোধক্ষম অ্যান্টিবায়োটিক আজকের অভিশাপ

সপ্তর্ষি সমাজদার

সর্বজনবিদিত সর্বগ্রাসী দূষণ পরিবেশের ভারসাম্য দৈনন্দিন বিঘ্নিত করছে। ভয়ংকর পরিবেশ দূষণের তাড়নায় খাদ্যদ্রব্যে ব্যাপক বিষপ্রয়োগের ফলস্বরূপ মানুষ নিত্যনতুন রোগের শিকার হচ্ছেন। বিপাকীয় ত্রুটিজনিত রোগগুলি বাদ দিলে অধিকাংশ রোগই কোন ও না কোন অনুজীবঘটিত রোগ। এই অনুজীবগুলি প্রতিরোধ করতে বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন জীবানুনাশক বা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

এরপর 6 পাতায়

বিকল্প শক্তির উৎস সমুদ্রের ঢেউ গুনে লাভ কি?

ডঃ সমীর কুমার ঘোষ

কথায় বলে, 'যার কোনো কাজ নেই, সে নাকি সমুদ্রতীরে বসে শুধু ঢেউ গুনে যায়'। সমুদ্রের ঢেউ গোনা নাকি কর্মহীনতারই এক লক্ষণ। সমুদ্রের ঢেউকে কার্যকরী করে তোলা কী বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নয়? এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হয়েছেন এবং কিছুটা ফলপ্রসূ কাজও হয়েছে।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে শক্তি ও তার উৎসের প্রবল চাহিদা ও অনটন। এই অনটনের মোকাবিলায়, সারা বিশ্ব আজ বিকল্প শক্তির উৎস সন্ধানে আগ্রহী। এই প্রসঙ্গে যে উৎসের কথা মনে আমাদের আসে, সেটি হল সমুদ্রের ঢেউ বা তরঙ্গ শক্তি। সমুদ্রের শক্তি অসীম এবং এই অসীম শক্তিসম্পদকে কী পৃথিবীর শক্তিচাহিদার পূরণে ব্যবহার করা যায় না? আমাদের দেশ ভারতবর্ষেই তার বিপুল পরিমান সমুদ্রতটরেখা এবং উত্তাল সমুদ্র, ভারতের শক্তি চাহিদার এক সফল সমাধান হিসাবে গণ্য হতে পারে।

এই উৎস শুধুমাত্র সহজলভ্যই নয় বরং এক বিশাল শক্তির অধিকারী। পৃথিবীর অন্যান্য কিছু উন্নতশীল দেশের ক্ষেত্রে, যারা এই বিশাল শক্তিভান্ডারকে কাজে লাগিয়েছে সফলভাবে, তাদের পাওয়া তথ্য থেকে দেখা যায় যে, প্রাপ্ত শক্তি ও তাকে কার্যকরী শক্তিতে রূপান্তরিত করার অনুপাত বিশেষভাবে উৎসাহব্যঞ্জক। সমুদ্রের ঢেউ থেকে শক্তি সংগ্রহের পদ্ধিতেকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

এরপর 2 পাতায়

বিজ্ঞান শিক্ষা

শ্রী সোহম চট্টোপাধ্যায়

আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। সাধারণ বিজ্ঞানের ক্লাসে স্যার এলেন। আমরা যাথারীতি উঠে দাঁড়ালাম। উনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা উঠে দাঁড়ালে কেন? যাঃ বাবা। এটা কোনো প্রশ্ন হল? আমাদের প্রাইমারী সেকশনে এটাইতো শিখিয়েছেন স্যারেরা, ম্যাডামেরা। স্যার, ম্যাডাম ক্লাসে এলে উঠে দাঁড়াতে হয়। যাই হোক। স্যার বললেন শুধু প্রথা হিসাবে নয়।

এরপর 3 পাতায়

স্যার হ্যারি ক্রোটোঃ বিজ্ঞান ও জীবন

অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

চলে গেলেন স্যার হ্যারল্ড ওয়াল্টার ক্রোটো। যিনি হ্যারি ক্রোটো নামেই বেশী পরিচিত ছিলেন।১৯৯৬ সালে কার্বনের একটি বহুরূপ (Allotrope) বাকমিন্‌স্টারফুলারিন (যা 'বাকিবল' নামেও পরিচিত) আবিষ্কারের কৃতিত্ব স্বরূপ তিনি রাবার্ট কার্ল ও রিচার্ড স্মলের সাথে রাসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৮৫ তে ক্রোটো তখন সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। টেক্সাসের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের

এরপর 5 পাতায়

সমুদ্রের ঢেউ গুনে লাভ কি?

1 পাতার পর

প্রথমটি হল যান্ত্রিক পদ্ধতি এবং দ্বিতীয়টি হল 'পয়োবাহী'। প্রথমক্ষেত্রে কিছু কাঠের ডুবুরী পাশাপাশি সাজিয়ে ঢেউয়ের সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে রাখা হয়, যে গুলি ঢেউয়ের আঘাতে প্রবলভাবে সামনে পিছনে নড়তে থাকে অথবা কিছু ভাসমান স্তূপ ঢেউয়ের আকারে সাজিয়ে জলের মধ্যে রাখা হয়। কাঠের ডুবুরীর ক্ষেত্রে দোদুল্যমান গতিকে কার্যকরী শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এবং সেই শক্তিকে তীরবর্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তি হিসাবে সঞ্চালিত করা যায়। পক্ষান্তরে কাঠের স্তূপের ক্ষেত্রে, তাদের পারস্পরিক গতির ফলে শক্তি, তাদের মধ্যে রাখা পয়োবাহী পাম্পের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। এক্ষেত্রে 'তরঙ্গ সংশোধক' এবং 'কম্পমান জলস্তর' পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রথম পদ্ধতিতে এক বিশাল আকৃতির কাঠামো থাকে, যার মধ্যে থাকে দুইটি জলাধার। এই দুইটির মধ্যে ভালভ থাকে যার ভিতর দিয়ে ঢেউ যান্ত্রিক উপায়ে নীচের জলাধার থেকে উপরের জলাধারে জলকে ঠেলে পাঠায়। এইভাবে দুইটি জলাধারের মধ্যে এক জলতলের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এই পার্থক্যের সাহায্যে টারবাইন চালানো সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে, একই উপায়ে আগত ঢেউগুলি একটি উল্টো করে রাখা পাত্রের মধ্যে জলের কম্পন সৃষ্টি করে এবং সেই পাত্র থেকে কম্পনশক্তিজনিত শক্তির সাহায্যে জলের বা বাতাসের টারবাইন চালানো সম্ভব হয়।

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঢেউয়ের শক্তিকে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা যথেষ্ট ফলপ্রসূ। কিন্তু এই পদ্ধতির অসুবিধা হল যে, এই পদ্ধতি শুধুমাত্র সামান্য এক তরঙ্গ-কম্পাঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেই তরঙ্গগুচ্ছের মধ্যকার তরঙ্গের বা ঢেউয়ের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি খুব কার্যকরী, কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ বিভিন্ন কম্পাঙ্কের হতে পারে, তবে সবথেকে বেশি ঢেউ আছড়ে পড়তে দেখা যায় ১৫ সেকেন্ড অন্তর। অবশ্য এই মান সারাদিনব্যাপী একই থাকে না। সেজন্য যান্ত্রিক পদ্ধতিতে, মোট ঢেউশক্তির সামান্য কিছু অংশমাত্রকে কার্যকরী শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়। সংগ্রাহক ব্যবস্থাটিকেও আগন্তুক ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে (কম্পাঙ্ক) কাজ করতে হয়। সেজন্য এই পদ্ধতির সাহায্যে শক্তি পেতে হলে, পরীক্ষাস্থানের ঢেউ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং ঢেউয়ের দিশা, গতিপথ ইত্যাদি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

বায়ুশক্তির তুলনায় তরঙ্গশক্তিতে, শক্তি যথেষ্ট ঘনীভূত অবস্থায় থাকে। প্রকৃতপক্ষে, সমুদ্র এক শক্তিশালী বায়ুশক্তি সংগ্রাহক। বায়ুশক্তিকে গ্রহণ করে বিশাল জলস্তরে সমুদ্র নিজ বক্ষে ঢেউ সৃষ্টি করে। ভারতের তটদেশে সমুদ্রের ঢেউ প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে, গড়ে ষাট কিলোওয়াট শক্তি সঞ্চিত থাকে। রূপান্তর ও পরিবহনজনিত ক্ষয় স্বীকার করে নিলেও, এই শক্তির পরিমান হবে, ঢেউয়ের প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০ কিলোওয়াট, যা অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া শক্তির তুলনায় যথেষ্ট বেশি। অন্যান্য উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের (জলবিদ্যুৎ, তাপবিদ্যুৎ, পারমানবিক বিদ্যুৎ) ব্যয়ভারের তুলনায়, ঢেউ বা তরঙ্গজাত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় তেমন বেশি নয়। আসল সমস্যাটি হল, ঢেউ শক্তিকে যথাযথভাবে কার্যকরী করে তোলার ব্যবস্থা করা।

কারিগরী এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক অসুবিধা– যেমন তটক্ষয়, এই কার্যকরী ব্যবস্থাগ্রহণে বাধা হতে পারে। এতসব নানা অসুবিধা সত্ত্বেও (আর্থিক ও যান্ত্রিক) অদূর অভিষ্যতে এই ঢেউ বা তরঙ্গশক্তি বাস্তব জীবনে এক বিকল্প শক্তির উৎস হিসাবে পরিগণিত হবেই। তার অন্যতম কারণ হল, ঢেউ আদি ও অনন্তকাল ব্যাপী বিরাজমান আছে ও থাকবে। এই অনন্ত উৎসের জন্য মানুষকে কিছুই ব্যয় করতে হবে না।

সুতরাং, নিঃশব্দ এক গোধূলিবেলায় পুরী, দীঘা বা ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে কেউ যদি আপনমনে ঢেউ গুনে যান সমুদ্রের এবং সেই বিশাল বিশাল ঢেউ থেকে অফুরন্ত শক্তি সংগ্রহের কথা চিন্তা করেন, সেক্ষেত্রে তাঁকে কি কর্মহীন এক ব্যক্তি বলে আখ্যা দেওয়া হবে!

যোগাযোগ ঃ পরমানু পর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
(মোঃ ৯৪৩৪১৫৭৭৫৩ / ৯২৩৩১৮৯১৭০)

কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান

হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার বিরোধী কমিটির পরিচালনায় উত্তর রাজপুর (আজাদী পাড়া), শুকুর আলি মন্ডলের বাড়িতে গত ৭ আগস্ট বিজ্ঞান মনস্কতা ও কুসংস্কার বিরোধী আলোচনা এবং পিছিয়ে পড়া মুসলিম মেয়েদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সতীশচন্দ্র মন্ডল। বিজ্ঞান মনস্কতা ও কুসংস্কার বিরোধী আলোচনায় শ্রী অরিন্দম ভৌমিক, ডাঃ গিরিধর বিশ্বাস, নিরঞ্জন বিশ্বাস, শুকুর আলি মন্ডল, স্বপন রায় ও ইলিয়াস মন্ডল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মূল আকর্ষন ছিল উত্তর রাজপুর আজাদি পাড়ার পিছিয়ে পড়া মুসলিম মেয়েদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরিচালনা করেন গ্রামেরই গৃহবধূ সাহাবানু মন্ডল ও তার ছাত্রীরা।

গ্রামবাসীদের প্রতিক্রিয়া ও উল্লাস ছিল চোখে পড়ার মত। তাদের কথায় গ্রামের মেয়েদের এবং বিশেষ করে গ্রামের বধূর কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ছিল কল্পনার অতীত। এই প্রথম এরকম অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে যা সত্যিই এক নজিরবিহীন ঘটনা। মিষ্টি বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিবেদক সাহাবানু মন্ডল
হরিণঘাটা

বিজ্ঞান শিক্ষা

1 পাতার পর

নয়। তোমরা উঠে দাঁড়াবে। শ্রদ্ধা করবে গুরুজনদের। কিন্তু কেন করছ নিজের মনকেই প্রশ্ন করবে। আমরা থতমত খেলাম। বসলাম। স্যার প্রশ্ন বললেন 'তোমরা কেউ বলতে পার বিজ্ঞান কাকে বলে। আমারই এক সহপাঠী আগে আগে পড়ে নিত সব। সেই বলল বিজ্ঞান শব্দের অর্থ 'বিশেষ জ্ঞান'। স্যার বললেন ঠিক বলেছ। কিন্তু কি জান এই শব্দবন্ধটা বড় গোলমেলে। আর কেউ বলতে পার। আর হাত উঠল না দেখে স্যারই বললেন 'বিজ্ঞান হল প্রশ্ন করার পদ্ধতি'। বিজ্ঞান পড়লে আমরা প্রশ্ন করতে শিখি। এমন সংজ্ঞা তারপরে আর কারও কাছে শুনিনি। এখনও বিজ্ঞান বই নিয়ে বসলেই স্যারের কথাটা কানে বাজে।

বিজ্ঞানের মূলকথা হল পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণ সূত্রে উপস্থাপিত হওয়া। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণ মতবাদে উপনীত হওয়া যায় তবে যদি পরীক্ষার ফল পর্যবেক্ষণকে সমর্থন করে তাহলে মতবাদ বা সূত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। পরীক্ষা লব্ধ ফল বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে পারেন, পর্যবেক্ষণে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে পারেন কিন্তু ফলের উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কোনো তত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত কিনা তা যাচাই করার জন্য একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। কোনো বিষয় একজনের ধারণায় আসার পর, পরীক্ষা করা জরুরী। পরীক্ষার ফল থেকে প্রকল্পের জন্ম হয়। প্রকল্পটি গভীর সমালোচনা করে, বিশ্লেষণ করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। এরপর পূর্ব পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। যদি দ্বিতীয় পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয় তবে প্রকল্পটি তত্ত্ব হয়ে দাঁড়ায়। এই যে পদ্ধতি যা আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতির মিশ্রণ, একে বিজ্ঞান পদ্ধতি বলা হয়। আমাদের বিদ্যালয়-বিজ্ঞানশিক্ষা এই পদ্ধতির শিক্ষা দেয় না। স্বভাবতই আমরা বিদ্যালয়স্তরে বিজ্ঞান পড়তে গিয়েও প্রশ্নোত্তর করি। নম্বর পাই। মোটা মাইনের চাকরি পাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেড়িয়ে। কিন্তু বিজ্ঞানী হয়ে উঠি না। বিজ্ঞানমনস্কও নই। সুতরাং দেশে বিজ্ঞানীর প্রয়োজন মিটছে না। মৌলিক চিন্তকদের সংখ্যা হাতে গোনা হয়ে যাচ্ছে। একজন শিক্ষর্থী বিদ্যালয়স্তর থেকে প্রশ্ন করতে যদি শেখে তবে তার মধ্যে বিজ্ঞান পড়ার ঝোঁক বাড়ে। উত্তর লিখতে বা বলতে চাওয়ার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জানা অংশ থেকে প্রশ্ন করতে দেওয়া। প্রশ্ন করার মানসিকতা থেকে উদ্ভাবনী শক্তির জন্ম হয়। সে কল্পনা করতে শেখে। পরীক্ষালব্ধ ফলকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শেখে। অন্ধভাবে বিশ্বাস করে না। আমাদের বিজ্ঞান-শিক্ষা পদ্ধতির তাই শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন। শুধু বিজ্ঞান বিষয় নয়, একজন শিক্ষার্থী যখন প্রশ্ন করতে শেখে তখন সে যে কোনো বিষয়কেই বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখে। তার মনটা বিশ্লেষণাত্মক হয়। এর অর্থ এই নয় যে শিক্ষার্থীর মন কল্পনাপ্রবণ থাকবে না, কবিতা পড়তে সে ভালোবাসবেনা। এই পদ্ধতি তাকে নতুন করে ভাবাতে শেখাবে। একটু যদি পিছন ফিরে তাকাই, যদি আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মক্ষণ ও তার বৃদ্ধির দিকে চোখ রাখি, দেখতে পাব এমনটি কিন্তু হওয়ার কথা ছিল না। ফ্রান্সিস বেকন নতুন বিজ্ঞান পদ্ধতির সূচনা করেন। নতুন দর্শনের জন্ম হল। নিয়মাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণাধীন পরীক্ষালব্ধ ফল হল জ্ঞানের প্রধান উৎস। এই রকম একটা দার্শনিক ভিত্তির ওপর ভর করে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসে এক বিশ্বাস– বিশ্বে যে সব ঘটনা ঘটছে বা ঘটবে সেগুলোর তথ্য নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় পরীক্ষা করা যাবে, গণিতের প্রয়োগ করা যাবে। এবং নক্সা দ্বারা উপলব্ধি করা যাবে। এখনও পর্যন্ত আরোহ পদ্ধতি ও অবরোহ পদ্ধতির মিশ্রণে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটছে। ধারণা / কল্পনা– পরীক্ষা–বিশ্লেষণ–প্রকল্প আরোহ পদ্ধতি। প্রকল্প–পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ-সিদ্ধান্ত অবরোহ পদ্ধতি। ফ্রান্সিস বেকন যে পদ্ধতির সূচনা করেছেন গ্যালিলিও তাতে সিলমোহর দিয়েছেন। নিউটন, যিনি যান্ত্রিক দর্শনের উদ্ভাবক তিনি গ্যালিলিওর মতাদর্শের ওপর আপন সৌধ গড়েছেন। নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' থেকে 'বিজ্ঞান-বিপ্লব' শুরু হয়। তার একশ বছর পরে প্রযুক্তি বিপ্লব। সত্যি কথা বলতে কি আজ এই প্রযুক্তির যুগে মৌলিক চিন্তার বড় করুণ দশা। বিজ্ঞানের এত এত গবেষণাপত্র, প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাধর্মী জার্নালে তার কটির মধ্যে মৌলিকত্ব রয়েছে। বেশির ভাগই উন্নতি-মূলক কাজ। কোনো কাজের বিস্তৃতি। বিশেষ করে আমাদের বিজ্ঞান-শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি এক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। মূল্যায়ন ব্যবস্থারও দায়িত্ব আছে। বিজ্ঞান-শিক্ষায় যে নমনীয়তা আবশ্যক তা এখানে অনুপস্থিত। তাই প্রয়োজন নতুন করে ভাবার। আমরা বিদ্যালয় বিজ্ঞান শিক্ষাকে যদি নতুন রূপ দিতে পারি তবে অনেক শৈশব উজ্জ্বল হয়ে উঠবে বিজ্ঞান চিন্তায়।

সপ্তদশ শতকের পর থেকে বিজ্ঞান চিন্তা সার্বজনীন হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে। আমরা তখন দেশের মধ্যেই যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত। অষ্টাদশ শতকের মাঝ বরাবর যখন ইউরোপে যান্ত্রিক দর্শণের প্রভাব সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রকে সহজ করে তুলছে, তখন আমরা নতুন করে পরাধীন হচ্ছি। ইংরেজদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করছি। স্বভাবতই আমাদের পিছিয়ে যেতে হচ্ছে। ইংরেজরা যেমন ভাবছে, তেমন ভাবেই শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে। তারই মধ্যে কয়েকজন চিন্তক ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বাদ নিলেন। তাঁরা সেই স্বাদ ভাগ করে নিতে চাইলেন। কিন্তু সে কাজও সহজ ছিল না। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে কয়েকজন বিজ্ঞানী হয়ে উঠলেন। আমাদের দেশে যাঁরা আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তার বীজ এতদিনে দেশের মধ্যে বপন করলেন। তারপর সামাজিক কারনেই বিজ্ঞান পড়ার ঝোঁক বেড়েছে। ছাত্রছাত্রীরা ভাবে বিজ্ঞান পড়লে তাড়াতাড়ি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে। চাকরী পাওয়া যাবে। তখনও গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন ছিল, আজ ভোগবাদী সমাজে অর্থের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। ফলে শিক্ষা পদ্ধতির শৈলী বদলে গেল। চটজলদি সব চাই। বিজ্ঞানী হওয়ার শিক্ষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় রইল না। ব্যাক্তিগত উদ্যোগে, ইচ্ছায় বিজ্ঞান পড়ে অনেকে বিজ্ঞানী হতে চাইছে যা আমাদের আশার আলো। কিন্তু চাই আরও উদ্যোগ। সমষ্টিগত উদ্যোগ। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা বিজ্ঞান গবেষনায়। শুধু পাঠক্রম নয়। পদ্ধতি, তা শিক্ষা পদ্ধতি বা মূল্যায়ন পদ্ধতি যাই হোক না কেন শৈশবকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার জরুরি।

যোগাযোগ ঃ মোঃ ৯৯০৩২৩২০৯১
email : scientificsoham@gmail.com

পিপীলিকা পুরাণ

1 পাতার পর

পরিবেশের দ্বীপগুলি ছাড়া সর্বত্র পিপড়েরা বাস করে। স্থলভাগে মোট প্রানিভরের প্রায় ১৫%-২৫% রয়েছে পিপড়েদের দখলে।

সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের এই বাড়বাড়ন্ত ছিলনা। একসময়ে মোট কীটপতঙ্গ ভরের মাত্র ১% জুড়ে ছিল পিপড়েরা। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মানিয়ে নেওয়ার অসীম ক্ষমতা, বিকিরণ সহ্যশক্তি, অভিযোজন প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান মজবুত করেছে তারা।

ইংরেজী **'Ant'** কথাটির অর্থ **'The Biter'** অর্থাৎ যারা কামড়াতে পারে। আকারে পিপড়ে ০.৭৫ মিমি - ৫২ মিমি পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রাচীন জীবাস্মে ৬৫ সেমি লম্বা পিপড়েও দেখা যায়। অধিকাংশেরই রং হয় লাল বা কালো, তবে সবুজ কিংবা ধাতব রঙের পিপড়েও দেখা যায়। পিপড়ের চোখ যৌগিক, যা পরস্পর সংযুক্ত অনেক ছোট ছোট লেন্স মিলে তৈরি হয়। পিপড়ে তার দুই চোখ দিয়ে সামনের পরিবেশ, নড়াচড়া, গতিবিধির উপর নজের রাখতে পারে। তবে একবারে স্পষ্ট ভাবে সব কিছু দেখতে পায় না। পিপড়ের মাথায় থাকে এক জোড়া অ্যান্টেনা। এর সাহায্যে সে কোন রাসায়নিক প্রকৃতি, বায়ুপ্রবাহ, কম্পন প্রভৃতি টের পায়। একাধিক পিপড়ে পরস্পরের অ্যান্টেনা স্পর্শ করে বিভিন্ন সংকেত পেতে বা দিতে পারে। পিপড়ের সামনে থাকে শক্তিশালী চোয়াল; যা খাদ্য পরিবহন, বাসা তৈরি, লড়াই প্রভৃতির কাজে লাগে। তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত পিপড়ের শরীরে থাকে মোট ছয়টি পা। জীবনের কোন কোন সময়ে উর্বর পুরুষ বা রাণী পিপড়ের শরীরে ডানার উপস্থিতি দেখা যায়। তবে তিন জোড়া পা হল তাদের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। নিজেদের বাসা থেকে প্রায় ২০০ মিটার পর্যন্ত এলাকায় পিপড়ে যাতায়াত করে। যাওয়া আসার পথকে নির্দিষ্ট গন্ধের মাধ্যমে চিহ্নিত করে রাখে, তাই পথ ভুল হয় না। কিছু কিছু গেছো পিপড়ে গাছের ডাল বেয়ে পিছলে বা **Glide** করে নেমে আসতে পারে। এক ডাল থেকে পাশাপাশি অন্য ডালে কিংবা যাওয়া আসার পথে অপ্রশস্ত জলরেখা পেরোনোর জন্য অনেক পিপড়ে পরস্পর যুক্ত হয়ে শৃঙ্খল সৃষ্টি করে ও বাধা পার হয়।

চিত্র ঃ কাজল গাঙ্গুলী

শ্রমিক পিপড়ে সাধারনত ১-৩ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। রাণী পিপড়ে কোন কোন ক্ষেত্রে ৩০ বছর অবধি বাঁচতে পারে। তবে উর্বর পুরুষ পিপড়ের আয়ু বেশ কম, অনেক ক্ষেত্রে মাত্র কয়েক সপ্তাহ।

পিপড়ের জীবনযাত্রা অতি সুশৃঙ্খল, নিয়মমাফিক হয়ে থাকে। তারা অনেকে মিলে কলোনি তৈরী করে বাস করে। নিজেদের জীবনে পিপড়েরা শ্রমবিভাজনে বিশ্বাসী। তাই সকল কাজ সবাই মিলে ভাগ করে নেয়। একটি বাসায় পুরুষ ও রাণী পিপড়ে বাদে অধিকাংশই শ্রমিক পিপড়ে থাকে। জীবনের প্রথমদিকে শ্রমিক পিপড়ে বাসার ভিতরে শিশু ও রাণীদের নিরাপত্তাবিধান প্রভৃতি কাজ করে থাকে। পরে কিছুটা অভিজ্ঞতা হলে তারা বাসা তৈরির কাজে লাগে। আর অভিজ্ঞ শ্রমিক পিপড়ে বাসা রক্ষা, খাদ্য সংগ্রহ প্রভৃতি কঠিন কাজ করে থাকে। কাজের ভিত্তিতে শ্রমিক পিপড়েকে অনেক ভাগে ভাগ করা যায়।

কৃষক পিপড়ে বীজ সংরক্ষণ করে, তাকে চোয়ালে পিষে রুটির মত খাবার তৈরি করে। বীজ ভিজে গেলে রোদ্দুরে শুকিয়ে নেয়। তাঁতি পিপড়ে নিজের শরীরের গ্রন্থি থেকে নির্গত সিল্ক জাতীয় সুতোর সাহায্যে একাধিক পাতাকে সেলাই করে বাসা তৈরি করে। এক গাছে অনেক বাসা নিয়ে একটি কলোনী তৈরি হয়। ছুতোর পিপড়ে গাছের কান্ডে ফুটো করে গ্যালারির মত বাসা তৈরি করে। তবে তারা উইপোকার মত গাছের বিপুল ক্ষতি করে না। আমাদের দেশে ঘোড়ানিম প্রভৃতি গাছের কান্ডে কাঠ পিপড়ের বাসা সহজেই দেখা যায়। নার্স পিপড়ে লার্ভা, পিউপা ও শিশুদের যত্ন নেয়। ডিম বা লার্ভাদের মুখে নিয়ে রোদ খাইয়ে আনে, যাতে বাড়বৃদ্ধি ভালো হয়। কোন কোন প্রজাতিতে পশুপালক পিপড়ে দেখা যায়, তারা নির্দিষ্ট ধরনের জাবপোকাদের পালন করে, তাদের জন্য কচি কান্ড, মুকুল প্রভৃতি খাদ্য রূপে যোগান দেয়। বিনিময়ে ঐ পোকারা তাদের শরীর থেকে এক প্রকার শক্তি বর্ধক তরল (**Honeydew**) নিঃসরণ করে, যা পিপড়েরা পান করে। বাসা ছেড়ে অন্যত্র স্থায়ীভাবে চলে যাওয়ার সময় ঐ জাবপোকাদেরও সঙ্গে নিয়ে যায়। অপর এক প্রজাতি নিজেদের বাসায় ছত্রাক প্রতিপালন করে। এজন্য ঐ ছত্রাকদের উপযোগী গাছের পাতা বাসায় বয়ে আনে, নির্দিষ্ট মাপে পাতা কেটে দেয়। তার উপর ছত্রাকের বংশবিস্তার ঘটে এবং অবশেষে তারা পিপড়ের খাদ্যে পরিনত হয়। কোন কোন পিপড়ে বাসায় সংগ্রহপাত্র রূপে কাজ করে। এরা বিপুল পরিমানে মিষ্টিরস পান করে বাসায় উল্টো হয়ে ঝুলে থাকে। নার্স পিপড়ে এদের কাছ থেকে প্রয়োজন মাফিক মধু সংগ্রহ করে শিশুদের পান করায়। পিপড়েদের বাসায় থাকে সৈনিক বা আক্রমনকারী একদল পিপড়ে। তারা দলবেঁধে প্রতিবেশি বাসায় আক্রমন করে সেখান থেকে খাদ্য, ডিম, লার্ভা প্রভৃতি লুঠ করে আনে। লুঠ করা ডিম ফুটে বেরোনো পিপড়ে মালিকের দাস রূপে পরবর্তী কালে কাজ করে।

কিছু প্রজাপতির পিপড়েকে বৃষ্টি বা বন্যার কারণে বাসায় জল ঢুকে গেলে সেই জল নিষ্কাশন করতে দেখা যায়। তারা বাসার ভিতরে জল পান করে বাইরে এসে ফেলে দেয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পিপড়েদের মধ্যে 'সুইসাইডাল স্কোয়াড' দেখা যায়। এরা রাত্রিবেলা বাসার ভিতরে সবাইকে রেখে মুখ বন্ধ করে বাইরে বাস করে। যেকোন বিপদে প্রথম বলি হয় এই পিপড়ের দল।

পিপড়ে সাধারণভাবে সর্বভূক প্রাণী, খাদ্যের সন্ধান পেলে বাসা থেকে খাদ্যের উৎস পর্যন্ত পথে শরীর থেকে নির্গত রাসায়নিকের দ্বারা নির্দিষ্ট গন্ধের সঙ্কেত ছড়িয়ে দেয়। প্রতিটি পিপড়ে খাদ্য নিয়ে আসা

এরপর 5 পাতায়

পিপীলিকা পুরাণ

4 পাতার পর

যাওয়ার সময় একই ভাবে গন্ধটিকে বজায় রেখে দেয়। খাদ্য নিঃশেষ হলে আর রাসায়নিক ত্যাগ করা হয়না এবং পথটি হারিয়ে যায়। চলার পথে কোনো পিপড়ে বিপদে পড়লে এভাবেই নির্দিষ্ট রাসায়নিক গন্ধ দ্বারা সকলকে সচেতেন করে দেয়।

পিপড়ের শক্তিশালী চোয়াল তাকে নিজের ওজনের প্রায় ২০ গুন অবধি মাল পরিবহনে সাহায্য করে। এছাড়া হুল ফোটানো পিপড়ের বিশেষ অস্ত্র। এক্ষেত্রে হুলের সাহায্যে বিভিন্ন রাসায়নিক যেমন ফরমিক অ্যাসিড প্রভৃতি প্রতিপক্ষের শরীরে প্রবেশ করায়। দক্ষিণ আমেরিকায় বুলেট পিপড়ের হুল বিশ্বের সকল কীটপতঙ্গের কামড়ের চেয়ে যন্ত্রনাদায়ক হয়।

মূলত মাটি বা বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা ভূপৃষ্ঠ, পাথরের ফাঁকে বা নীচে গাছের কান্ডে-ডালে-পাতায় পিপড়ে বাসা করে। স্থান নির্বাচন, বাসা তৈরিতে ব্যবহৃত পদার্থ প্রভৃতি দ্বারা বাসায় উষ্ণতা, বায়ুচলাচল, প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার কিছু প্রজাতির পিপড়ে বাসাই তৈরি করে না, যাযাবরের মত জীবন যাপন করে।

বাসা থেকে দূরে যাওয়ার সময় পদক্ষেপ স্মরণে রাখে এবং ফিরে আসে। সূর্যের অবস্থান বিচার করে যাত্রাপথের দিক ঠিক করে। কিছু প্রজাতির পিপড়ে এক্ষেত্রে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্য নেয়।

ক্রান্তীয় অঞ্চলে পিপড়ে সারাবছর সক্রিয় থাকে। শীতল অঞ্চলে পিপড়ে শীত ঋতুতে নিষ্ক্রিয় থাকে। এজন্য আগে থেকেই নিজেদের খাদ্য যোগাড় করে রাখে।

এভাবে নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা, দলবদ্ধ ভাবে বসবাস, পারস্পরিক নির্ভরতা ও বিশ্বাস পিপড়েদের দীর্ঘসময় ধরে পৃথিবীর বুকে টিঁকে থাকতে সাহায্য করেছে। অসংখ্য প্রজাতির পিপড়ে তাদের চমকপ্রদ জীবনযাত্রা সহ অনেকটাই মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই পৃথিবীর বুকে উপভোগ করে চলেছে তাদের পার্থিব জীবন। তবু ভুলে গেলে চলবে না পৃথিবীর বুকে প্রতি এক জন মানুষ পিছু রয়েছে প্রায় দশলক্ষ পিপীলিকা।

যোগাযোগ ঃ মোঃ ৯৮৩৬৫৬৯৮৫০

স্যার হ্যারি ক্রোটো বিজ্ঞান ও জীবন

1 পাতার পর

দু'জন অধ্যাপক রবার্ট কার্ল এবং রিচার্ড স্মলের সাথে জুটি বেঁধে শুরু করলেন এক জটিল পরীক্ষা। কার্বনের ওপর লেজার ভ্যাপোরাইজেশন পদ্ধতির প্রয়োগ ওনারা এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চাইলেন যা অনেকটা নক্ষত্রমন্ডলগত রাসায়নিক অবস্থার সাথে তুলনীয়। ফলস্বরূপ তারা পেলেন ৬০টি কার্বন পরমাণু দিয়ে তৈরী এক বিশেষ আনবিক গঠনাকৃতি, যা সম্পুর্ণ অপ্রত্যাশিত। গ্রাফাইট, হীরা প্রভৃতি কার্বনের রূপভেদগুলির কথা জানা থাকলেও এমনটি কখনো ভাবা যায়নি। ১২টি সুষম পঞ্চভূজ ও ২০টি সুষম ষড়ভূজ দিয়ে তৈরী এই সুন্দর জ্যামিতিক গঠনাকৃতিটিকে হ্যারি নাম দিলেন বাকমিন্স্টারফুলারিন, বিখ্যাত আমেরিকান স্থপতি বাকমিন্স্টার ফুলারের নামানুসারে। ফুলারিন আবিস্কারের সাথে সাথে আরো বেশী সংখ্যক পরমাণুযুক্ত কার্বনের খাঁচা আকৃতির (**Cage Shaped**) বিভিন্ন গঠনের সন্ধানও বিজ্ঞানীরা পেতে শুরু করেন। আর পরবর্তী কয়েক বছরেই কার্বন ন্যানোটিউব আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ন্যানোটেকনোলজি নামে বিজ্ঞানে প্রয়োগ সম্ভাবনাময় এক নতুন শাখার সূচনা হয়।

১৯৩০ দশকে এডিথ (**Edith**) এবং হেইনজ ক্রোটোশ্চিনার (**Heinz Krotoschiner**) নামে এক ইহুদি দম্পতি রিফিউজি হিসাবে ইংল্যান্ডে আসেন যারা পরবর্তীতে তাদের পদবী ক্রোটো লিখতে শুরু করেন। কেমব্রিজের কাছে উইজবেক এই পরিবারেই হ্যারির জন্ম হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন হ্যারির বাবাকে ইসলে-অফ-ম্যান দ্বীপে শত্রু হিসাবে অন্তরীন রেখে ওর মা'কে উইজবেক থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর যুদ্ধ থেমে গেলে পরিবারটি বোল্টোনে পাকাপাকি ভাবে থাকতে শুরু করে। সংসার চালতে হেইন্জ আরম্ভ করেন খেলনা বেলুনের ব্যবসা। হ্যারি ভর্তি হয় স্থানীয় বোল্টোন স্কুলে। পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলা এমনকি প্রায় সব ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেও হ্যারি ঈর্ষণীয় সাফল্য পেতে শুরু করে। বিজ্ঞান ভালোবেসে ফেলা ছেলেটি তার শিক্ষক হ্যারি হিয়ানে (**Harry Heaney**)-র অনুপ্রেরণায় শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসায়ন নিয়ে পড়াশুনা শেষ করে এবং তারপর মলিকিউলার স্পেকট্রোস্কোপি-র উপর গবেষণাধর্মী কজের জন্য পি.এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৭ তে হ্যারি সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বিভাগ 'স্কুল অফ কেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকিউলার সায়েন্সেস'-এ টিউটোরিয়াল ফেলো হিসাবে যোগ দেন। তারপর ক্রমে লেকচারার, রিডার ও ১৯৮৫-তে রাসায়নের অধ্যাপক হিসাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিলো তার দীর্ঘ সময়ের কর্মক্ষেত্র।

সাসেক্স সহকর্মীদের কাছে ভীষণ মজার মানুষ হ্যারি আবার একই সাথে সৃজনশীল এবং উদ্যোমী। রাসায়ন বিভাগের খ্রীসমাস অনুষ্ঠানে নানারকম অভিনয়, পরিচালনা, লেখালেখি এমনকি স্কেচ করতেও দেখা যেত অধ্যাপক হ্যারি ক্রোটোকে। সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের ইস্তেহার -এর কভার ডিজাইনও তিনি করেছেন। ২০১১- তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত বইটির কভারেও তো হ্যারির ডিজাইন। হ্যারি একাধারে খুব উচু মানের শিক্ষক ও উপস্থাপক। রসায়ন ছাড়া বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা ও নানারকম সৃজনশীলতার প্রতি তার দক্ষতা ও ভালোবাসা খুব সহজেই বিপুল পরিমান দর্শকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারতেন। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ক্লাসরুমে হ্যারির লেকচারগুলো এতটাই ভালো এবং অনুপ্রেরণা দায়ক হতো যে তার সহকর্মীরাও সেগুলো শোনার জন্য মুখিয়ে থাকতেন।

১৯৯৪ তে তিনি 'ভেগা সায়েন্স ট্রাস্ট' নামে একটি ব্রডকাস্ট আর্কাইভ গঠন করেন,যেখানে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা নিজে তাদের কাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরে তিনি গড়ে তোলেন **GEOSET** (**Global Educational Outreach for Science, Engineering and Technology**)। এর উদ্দেশ্য হলো বিনা পয়সায় উন্নতমানের **teaching material** ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষকদের মাধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

১৯৯০ সালে রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হওয়ার পর হ্যারি ১৯৯৬ তে ভূষিত হন নাইট উপাধিতে। ২০০২ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত 'রয়েল সোসাইটি অফ কেমেস্ট্রি'-র প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন নানা রকম কার্যকলাপের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন সভ্যতা ও অগ্রগতিতে রসায়নের গুরুত্ব।

এরপর 6 পাতায়

প্রতিরোধক্ষম অ্যান্টিবায়োটিক আজকের অভিশাপ

1 পাতার পর

এই অ্যান্টিবায়োটিক যখন সাড়া না দিয়ে প্রতিরোধক্ষম হয়ে পড়ে তখনই মানুষকে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিরোধক্ষম **Superbugs** গুলি সন্মন্ধে যদি আমরা সতর্ক না হই তবে মানব জীবন অচিরেই দুঃসহ হয়ে উঠবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে অনুজীব প্রতিরোধক্ষমতা আজ পৃথিবীতে একটি বিশেষ চিন্তার বিষয় কারণ এরূপ ঘটতে থাকলে আগামীদিনে রোগের চিকিৎসা অসম্ভব হয়ে পড়বে। কতকগুলো রোগে এই সমস্যা মারাত্মক হয়ে পড়েছে যেমন যক্ষা রোগে–২০.৫%, ম্যালেরিয়া রোগে–১০%, ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে–৩-৪% প্রতিরোধক্ষমহীন হয়ে পড়েছে। এই সকল সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য বিজ্ঞানীরা যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা হল–

–সংক্রামক রোগের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
–পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
–চিকিৎসকের নির্দেশমত জীবানুনাশক ওষুধ সেবন করতে হবে।
–চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে জীবানু প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
–চিকিৎসকের নির্দেশ ছাড়া ইচ্ছামত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাওয়া চলবে না।
–নির্দিষ্ট রোগে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে।

আধুনিক কালে গবেষকরা এই বিষয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী গবেষণা করছেন এবং অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ গড়ে ওঠার কারণগুলি ব্যাখ্যা করা চেষ্টা করছেন। প্রথমতঃ সংক্রমণ যাতে না ঘটে সেই ব্যাপারে উল্লেখ করছেন। দ্বিতীয়তঃ সংক্রমণ ঘটে গেলে নির্দিষ্ট রোগের নির্দিষ্ট ওষুধ, নির্দিষ্ট সময় ব্যবহারের কথা বলেছেন।

আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে ব্যাকটেরিয়ার প্রতিরোধক্ষমতা দূর করতে একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল–(**Switchable Polymer Combating Techique**)–যেখানে বলা হচ্ছে পলিভিনাইল অ্যাসিটোনের মত পলিমার ব্যাকটিরিয়ার কোষপর্দা ভেদ করে প্রবেশ করে উৎসেচকের কার্যকারিতা নষ্ট করে, ফলে ব্যাকটেরিয়ার প্রতিরোধক্ষমতা নষ্ট হয়। আবার প্রাকৃতিকভাবে জীবানুনাশকের প্রতিরোধক্ষমতা মোকাবিলা করার জন্য ব্রাজিলিয়ান উইপোকার ব্যবহার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা। এই পোকার ব্যবহারে লক্ষ্য করা যায় কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিক যেমন– এরিথ্রোমাইসিন, জেন্টোমাইসিন জাতীয় জীবানুনাশকের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দিয়ে ব্যাকটিরিয়া প্রতিরোধক্ষমতাকে দূর করে।

সবশেষে বলি যদিও আজকের দিনে জীবানুনাশকের প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি একটি জ্বলন্ত সমস্যা– যা বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন না আমরা জীবানুনাশক ওষুধের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছি। এই ভয়ংকর সমস্যা থেকে যাতে অচিরেই মুক্ত হতে পারি সে জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী গবেষকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন– যা অত্যন্ত আশার বিষয়। প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি একটি জ্বলন্ত সমস্যা– যা বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন না আমরা জীবানুনাশক ওষুধের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছি। এই ভয়ংকর সমস্যা থেকে যাতে অচিরেই মুক্ত হতে পারি সে জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী গবেষকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন– যা অত্যন্ত আশার বিষয়।

যোগাযোগ ঃ ১৩৩/ এ, তালবাগান মেইন রোড,
নোনাচন্দনপুকুর কলকাতা - ৭০০১২২
Email : saptarshisamajdar20@gmail.com

স্যার হ্যারি ক্রোটো বিজ্ঞান ও জীবন

5 পাতার পর

২০০৪ এ হ্যারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন সন্মানীয় 'ফ্রান্সিস ইপ্স অধ্যাপক' হিসাবে এবং কার্বন নিয়ে গবেষণা ও পৃথিবী ব্যাপী তার শিক্ষা সম্পর্কীত কর্মকান্ড চালিয়ে যান। ২০১৫ তে অবসর গ্রহণের পর তিনি ফিরে আসেন তার নিজের জায়গা সাসেক্স।

ইহুদি পরিবারে জন্ম হলেও হ্যারি কিন্তু অবিশ্বাসী এবং ভীষণ ভাবে নাস্তিক। তিনি বলতেন 'অমরত্ব কথাটি আসলে মানুষের মরণশীলতার মুখোমুখি দাঁড়াতে না পারারা সাহসের অভাব"। সমগ্র বিশ্বকে শিক্ষিত করার জন্য একের পর এক উদ্দ্যোগ গ্রহণকারী এই মানুষটি নিজেকে ইহুদি বলেও কোনো জায়গায় পরিচয় দিতেন না। বলতেন আমার একটাই ধর্ম আন্তর্জাতিকতাবাদ। বেশ কিছুদিন ধরেই দুরারোগ্য স্নায়ুর অসুখ **ALS(Amyotrophic lateral sclerosis)** যা অধ্যাপক স্টিফেন হকিং-এরও অসুখ)-এর প্রভাবে জীবনের গতিবিধি সংযত হয়ে আসছিল। অবশেষে সত্যিই মুত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালেন আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী এই নাস্তিক মানুষটি।

অধ্যাপক স্যার হ্যরল্ড ওয়াল্টার ক্রোটো

জন্ম ঃ ৭ই অক্টোবর ১৯৩৯, মৃত্যু ঃ ৩০ শে এপ্রিল ২০১৬

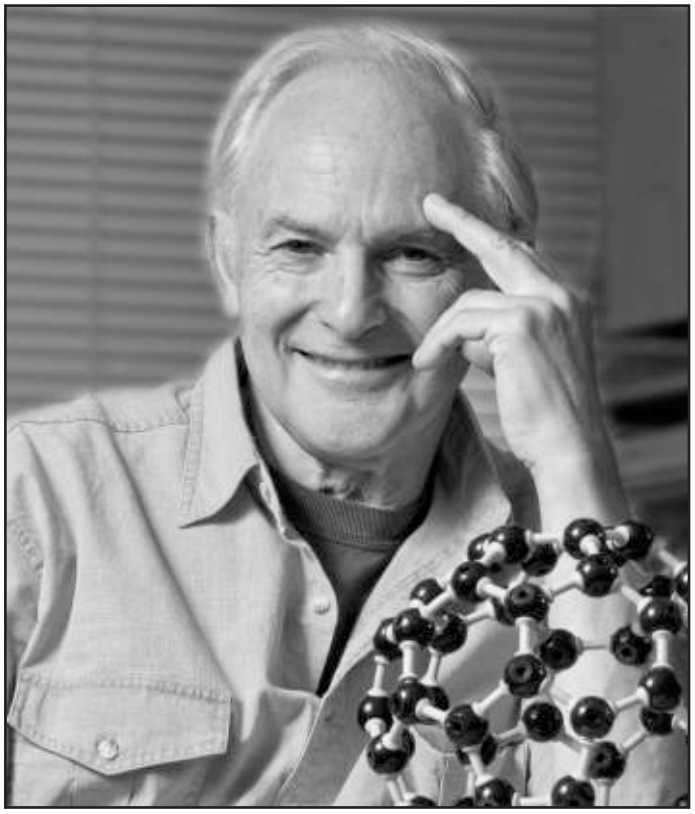

যোগাযোগ ঃ **E-mail : acnbu13@gmail.com**

মহাকাশে মানমন্দির ঃ অ্যাস্ট্রোস্যাট

রতন দেবনাথ

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা উৎক্ষেপন কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপিত হল 'অ্যাস্ট্রোস্যাট'– মহাকাশে মানমন্দির গড়ার লক্ষ্যে ভারতের প্রথম প্রয়াস। অ্যাস্ট্রোস্যাট বা অ্যাস্ট্রোনমিকাল স্যাটেলাইট মহাকাশে নিরন্তর ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান বা সুদূর মহাকাশ গবেষণার এক আধুনিক হাতিয়ার।

মানুষের চোখকে হাতিয়ার করে শুরু জ্যোতির্বিজ্ঞান-এর পথ চলা। খালি চোখে আকাশ পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়েই চেনা হয়েছে অনেক গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা, ধূমকেতু এসব মহাজাগতিক বস্তু। কিন্তু খালি চোখে আকাশ পর্যবেক্ষণের রয়েছে অনেক বাধা। তাই বলে জ্যোতির্বিজ্ঞান থেমে থাকেনি। আবিষ্কৃত হয়েছে টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র। পর্যবেক্ষণের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে যা অনেক দূরের আকাশকেও হাজির করেছে মানুষের চোখের সামনে। তন্য তন্য করে আকাশ খুঁজে এনছে আরও নতুন নতুন মহাজাগতিক বস্তু।

পৃথিবীতে বসে আকাশ পর্যবেক্ষণে পৃথিবীকে ঘিরে থাকা বায়ুমন্ডল এক বিরাট বাধা। রাতের আকাশে দূরের গ্রহ নক্ষত্র থেকে ঠিকরে পড়া আলো বায়ুর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে পৌঁছালে তার গুনগত পরিবর্তন ঘটে যায় অনেক। ফলে দূরের কোন মহাজাগতিক বস্তুর বিম্বে ঘটে অনেক বিকৃতি। বিম্ব হয় অস্পষ্ট। এ অসুবিধা কাটাতে টেলিস্কোপ বসানো হয় সাধারনত কোন উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অথবা বেলুনে চড়িয়ে পাঠান হয় উর্দ্ধাকাশে। কিন্তু তাতেও সুরাহা তেমন হয় না। বাতাসজনিত প্রতিবন্ধকতা থেকেই যায়। তাই সবচেয়ে ভাল বায়ুমন্ডলের বাইরে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করা। এতে প্রতিবিম্বের বিকৃতি থেকে যেমন নিস্তার পাওয়া যায় তেমনি মহাজাগতিক বস্তুগুলোকে দৃশ্যমান আলো ছাড়াও অবলোহিত রশ্মি, অতিবেগুনি রশ্মি, এক্স-রশ্মি এমনকি গামা রশ্মির নিরিখেও বিশ্লেষণ করা যায়। কারণ এ সব রশ্মির অনেকটাই পৃথিবীতে পৌঁছানোর আগেই শোষিত হয়ে যায়। হাবল স্পেস টেলিস্কোপ (১৯৯০), কম্পটন গামা-রে অবজারভেটরি (১৯৯১), চন্দ্র এক্স-রে টেলিস্কোপ (১৯৯৯) এ সবই পৃথিবীর বাইরে থেকে মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান তথা জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানকে উন্নীত করেছে এক নতুন মাত্রায়।

অ্যাস্ট্রোস্যাট জ্যোতির্বিজ্ঞানের একরকমই একটি পরীক্ষাগার যা পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করবে মহাকাশ। অ্যাস্ট্রোস্যাট-এর পরিকল্পনার শুরু ২০০৪ সালে। ১৯৯৬-এ ইন্ডিয়ান এক্স-রে অ্যাস্ট্রোনমি এক্সপেরিমেন্ট-এর সাফল্যের পর ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) অ্যাস্ট্রোস্যাট-এর মত একটি বহুমুখী আকাশ মানমন্দির-এর পরিকল্পনা নেয়। ভারতের এবং ভারতের বাইরের বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার উদ্যোগে অ্যাস্ট্রোস্যাট-এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নির্মাণের পর প্রায় ১৫০০ কেজি ভরের এই গবেষণা উপগ্রহটিকে পি এস এল ভি-সি ৩০ যানের সওয়ারী করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মহাকাশে। পৃথিবী থেকে প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার উপরে নিরক্ষরেখার সাথে প্রায় ৬ ডিগ্রি কোণে নত কক্ষপথে আপাতত উপগ্রহটির ঠিকানা। সুদূর মহাকাশের অজানা তথ্যের সন্ধানে প্রায় বছর পাঁচেক কাটাবে সেখানেই।

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনে উপগ্রহে যে সব যন্ত্রাংশ বসিয়ে দেওয়া হয় বিজ্ঞানের পরিভাষায় তা হল পে-লোড। অ্যাস্ট্রোস্যাট-এ যে সব পে-লোড বসানো হয়েছে তার ভর প্রায় ৭৫০ কেজি। এই পে-লোডগুলির মধ্যে রয়েছে– আল্ট্রা-ভায়োলেট ইমেজিং টেলিস্কোপ, সফট এক্স-রে ইমেজিং টেলিস্কোপ, লার্জ এরিয়া এক্স-রে প্রপোরশনাল কাউন্টার, ক্যাডমিয়াম জিঙ্ক টেলুরাইড ইমেজার, স্ক্যানিং স্কাই মনিটার, চার্জড পার্টিকল মনিটর ইত্যাদি। অ্যাস্ট্রোস্যাট-এর একটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট হল যে এটা দিয়ে একসঙ্গে বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তু থেকে আসা একাধিক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বিশ্লেষণ সম্ভব। দৃশ্যমান আলোক ছাড়াও অতিবেগুনী রশ্মি, নিম্ন এবং উচ্চ শক্তির এক্স-রশ্মির বিষয় গুলোও খুঁটিয়ে দেখবে অ্যাস্ট্রোস্যাট। আল্ট্রা-ভায়োলেট ইমেজিং টেলিস্কোপ অতিবেগুনী রশ্মির তিনটি বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিস্তার বিশ্লেষণ-এর কাজটি করবে সফট এক্স-রে ইমেজিং টেলিস্কোপ। উচ্চ শক্তির কঠিন এক্স-রে রশ্মির বিশ্লেষণ যন্ত্রটি হল ক্যাডমিয়াম জিঙ্ক টেলুরাইড ইমেজার। চার্জড পার্টিকল মনিটর-এর কাজ হবে বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সুরক্ষার দেখভাল করা। পৃথিবীর চারপাশ দিয়ে ঘোরার সময় অ্যাস্ট্রোস্যাট প্রায় মিনিট পনেরো-কুড়ি সাউথ আটলান্টিক অ্যানোমালি অঞ্চলে ঢুকবে। এই অঞ্চলে কম শক্তিসম্পন্ন ঝাঁক ঝাঁক প্রোটন এবং ইলেক্ট্রন কণা আছড়ে পড়ছে অবিরত। এর ফলে সৃষ্ট বিভবে যন্ত্রাংশগুলির ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। ফলে কমে যেতে পারে যন্ত্রের আয়ুষ্কাল। চার্জড পার্টিকল মনিটর থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে উচ্চ বিভব নিয়ন্ত্রণ করে যন্ত্রটিকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা হবে।

বিগত তিন দশক যাবৎ মহাকাশ বিজ্ঞানে ভারতের অগ্রগতি অভাবনীয়। সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে চন্দ্রযান এবং মঙ্গলযান। রিমোট সেনসিং যোগাযোগ, নেভিগেশন ইত্যাদি প্রয়োগমূলক কাজের জন্যও পাঠানো হয়েছে অনেক উপগ্রহ। অ্যাস্ট্রোস্যাট-এর লক্ষ্য সেদিক থেকে একটু আলাদা। জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়া যা ঘটে চলেছে সুদূর মহাকাশে তারই তত্ত্বতালাশ অ্যাস্ট্রোস্যাট-এর মূল লক্ষ্য। নিউট্রন স্টার এবং কৃষ্ণ-গহ্বর সমন্বিত যুগল তারায় ঘটে যাওয়া উচ্চশক্তির খেলা, নিউট্রন স্টারের চৌম্বক ক্ষেত্রের হিসাব-নিকাশ, নক্ষত্রের জন্য এবং নক্ষত্র পুঞ্জে উচ্চশক্তির প্রক্রিয়া এসব বিষয় সম্বন্ধে সম্যক ধারনা পাওয়াই মূল লক্ষ্য অ্যাস্ট্রোস্যাট-এর। এছাড়াও সুদূর ,হাকাশে নতুন নতুন এক্স-রশ্মির উৎস সন্ধানও করবে অ্যাস্ট্রোস্যাট।

বিজ্ঞান অন্বেষকের উদ্দ্যোগ

৪ অক্টোবর, ২০১৬ কাঁচরপাড়া উদ্‌বোধিনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় (হাই) তে ১০৩ তম বিজ্ঞানী অবনীভূষণ ঘোষ জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। ১৬ টি স্কুলের প্রায় ১০০ ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের শংসাপত্র ও বই পুরস্কার দেওয়া হয়।

পার্থেনিয়াম

শমীক দে

ভূমিকা ঃ পার্থেনিয়াম (**Parthenium**) গাছটির সাথে আমরা সকলেই কম বেশি পরিচিত। গাছটিকে আমরা আমাদের প্রায় সবদিকেই জন্মাতে দেখি। প্রথমেই বলে রাখি, এটি একট আগাছা (**Weed**), আরও বিস্তৃতভাবে বলা যেতে পারে বহিরাগত আগাছা (**Invasive Allien Weed**)। বর্তমানে গাছটি কিন্তু একটা বড়ো সমস্যার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

উৎস ঃ আগেই বলেছি গাছটি বহিরাগত। গাছটি আমাদের দেশে এসেছে আমেরিকা দেশ থেকে। আমাদের দেশে গাছটি প্রথম পাওয়া যায় মাহরাষ্ট্রের পুণেতে, ১৯৫৫ সালে। পশ্চিমবঙ্গে গাছটি এসেছে ১৯৭৫ সালে এবং পাওয়া গেছে বর্ধমানের ডানকুনিতে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ প্রথমে আমরা উদ্ভিদ জগতে গাছটির অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করি। গাছটির–

Class : Anigiospermae
Order : Campanulatae
Family : Asteraceae
Tribe : Heliantheae
Subtribe : Ambrosiinae
Genus : Parthenium
Species : Hysterophorus

গাছটি প্রায় সবধরনের মাটিতে জন্মাতে পারে। তবে অতিরিক্ত ক্ষারীয় মাটি (**Alkaline Soil**) এর পক্ষে অনুকুল নয়। আমরা অনেক সময় গাছটিকে মাটিতে ছড়িয়ে থাকতে দেখি এবং বৃদ্ধি তখন খুব একটা হয় না। এটিকে **Rosette Stage** বলা হয়। মাটিতে যখন জল পর্যাপ্ত (**Moisture Stress**) থাকে না, তখন **Rosette Stage** পরিলক্ষিত হয়। এই সময় গাছটি কিন্তু তাদের শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়াকলাপ ঠিকঠাক রাখে ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড অক্সাডেস (**IAAL**) এবং পারক্সিডেজ (**Paroxidase**) উৎসেচকের মাধ্যমে। এরপর বর্ষার জল পেলেই গাছটি কিন্তু দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায় এবং এর ফলে পার্শ্ববর্তী গাছ-গাছালির বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়।

গাছটি সাধারণত বংশবিস্তার করে বীজের (**Seed**) মাধ্যমে। একটা পরিণত পার্থেনিয়াম গাছ ১৫,০০০ বীজ তৈরী করে। বীজগুলি খুব হালকা এবং তারা সহজেই জল ও বাতাসের মাধ্যমে প্রবাহিত হতে পারে। একমাত্র এই কারনেই পার্থেনিয়াম গাছ দমন করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। একটি পরিণত পার্থেনিয়াম গাছ কমপক্ষে ৭০০০ ফল (**Cypsella**) তৈরী করতে পারে।

গাছটি থেকে আমরা কি কি পেয়ে থাকি? সাধারণত আমরা প্রত্যেকে পার্থেনিয়াম গাছকে একটা বিষাক্ত গাছ বলেই গণ্য করি। প্রায় এটা শুনে থাকি, যে এই গাছে হাত দিলে হাত চুলকায়, জ্বালা করে। এর কারণ, যদি আমরা গাছটিকে খুব খুটিয়ে দেখি, দেখব অসংখ্য রোম (**Trichome**) রয়েছে পুরো গাছটিতে। এই **Trichome** গুলি **Parthenin** নামে একটি বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করে যেটা আমাদের দেহে চুলকুনির সৃষ্টি করে। এছাড়া গাছটি যেখানে জন্মায়, সেখানকার মাটিতে বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড (**Organic Acid**) তারা নিঃসৃত করে।

জৈব অ্যাসিডগুলি হল–

- **Caffcic Acid**
- **Ferulic Acid**
- **Anisic Acid**
- **p-coumaric acid**
- **p-hydroxybenzoic acid**

এই সমস্ত জৈব অ্যাসিড মাটির ক্ষয়সাধন করে এবং চাষের অনুপযুক্ত করে তোলে।

<u>উপকারী ভূমিকা ঃ</u> আপনাদের মনে হতেই পারে, যে গাছের এত অপকারী দিক আছে, সেই গাছের আবার উপকারী দিক থাকতে পারে না কি? এটা কিন্তু ভুল। পার্থেনিয়াম-এর নানা উপকারী দিক আছে। উপকারী দিকগুলি আমরা এবার আলোচনা করি–

১) কম্পোস্ট সার প্রস্তুতি ঃ পার্থেনিয়াম এর কচি চারা (**young seedling**) দিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরী করা হয়। সেই সার থেকে আমরা ৩০৬% নাইট্রোজেন, ১% ফসফরাস এবং ১% পটাশ পেয়ে থাকি যা জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে।

২) জৈব কীটনাশক (**Bio-pesticides**)ঃ পার্থেনিয়াম গাছের নিঃসৃত রস (**Extracts of Parthenium**) ব্যবহৃত হয় ল্যাদা পোকা দমনে।

৩) জৈব গ্যাস প্রস্তুতি (**Bio gas**) ঃ পার্থেনিয়াম গাছ গরুর মূত্রের (**Cattle urine**) সাথে মিশিয়ে জৈব গ্যাস তৈরী করা হয়।

৪) জৈব আগাছানাশক প্রস্তুতি (**Bio-herbiside**) ঃ পার্থেনিয়াম নিজে একটা আগাছা, অথচ এটি থেকে আমরা আগাছানাশক পেয়ে থাকি। ১০% পার্থেনিয়ামের জলীয় দ্রবণ (**10% aqua extract**) আগাছানাশক হিসবে ব্যবহৃত হয়। পার্থেনিয়াম গাছের শিকড় নিঃসৃত রস (**root extract**) মুথা ঘাস (**Gypsum rotundus**) দমনে ব্যবহৃত হয়।

৫) ফুল ফোটার আগের (**Pre-flowering**) দশায় পার্থেনিয়াম গাছ একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস প্রোটিন, **Vit. A, E and** জ্যন্থোফিল এর।

সুতরাং আমরা দেখলাম যে, অপকারী দিকের সাথে পার্থেনিয়ামের অনেক উপকারী ভূমিকা আছে। কিন্তু চাষীভাইদের কাছে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে তারা পার্থেনিয়াম চাষে উদ্যোগী হয় না। আমাদের এটা উচিত তাদের কাছে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান সরবরাহ করা এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী করে তোলা।

যোগাযোগ ঃ মোঃ ৮৯৬১৯০৩২৫১
email : deyshamik93@gmail.com

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস ঃ প্রিন্ট জোন, ৫/১, রামনাথ বিশ্বাস লেন, শিয়ালদহ, কোলকাতা ৭০০০০৯
সম্পাদক ঃ শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০ / ৯৪৭৪৩৩০০৯২

email : ganabijnan@yahoo.co.in
bijnandarbar1980@gmail.com